প্রথম আলো

কলাম

অভিমত-বিশ্লেষণ

শিক্ষার জন্য বিশ্ব কেন আমাদের কাছে আসবে

দেশের প্রাথমিক শিক্ষার মৌলিক পরিবর্তন করতে হলে বৈশ্বিক গতিপ্রকৃতি যেমন বুঝতে হবে, তেমনি আমাদের দেশীয় উদ্ভাবনী শিক্ষা-উদ্যোক্তাদের সঙ্গেও রাষ্ট্রকে মুক্তমনে সংলাপে বসতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন নিয়ে লিখেছেন **এম নিয়াজ আসাদুল্লাহ**

প্রকাশ: ১১ জুন ২০২৬, ১৭: ১০

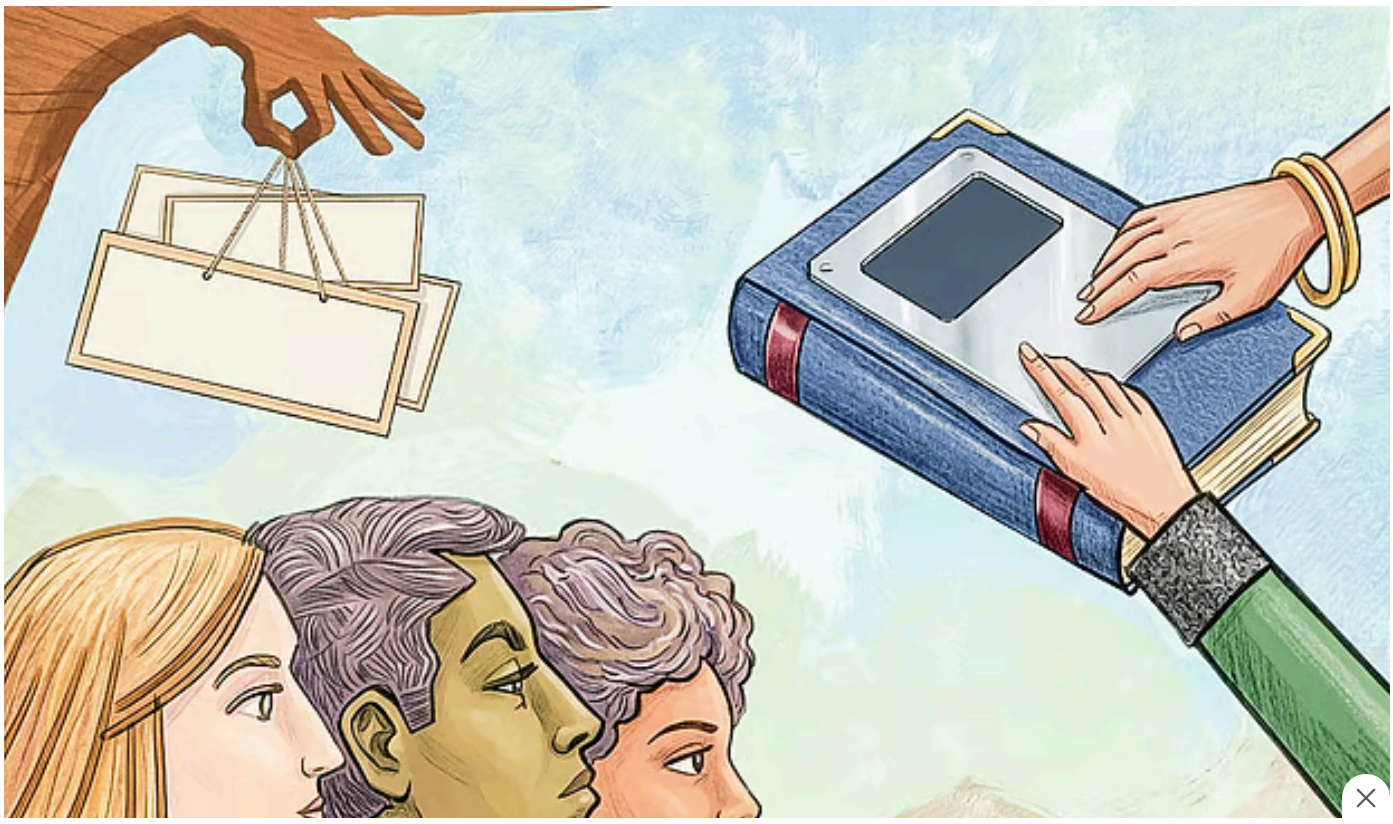

এম নিয়াজ আসাদুল্লাহ

সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর একটি বক্তব্য দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একটি স্বপ্ন উল্লেখ করে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, বর্তমান সরকার এমন এক শিক্ষাব্যবস্থা তৈরি করতে চায়, যেখানে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশে পড়তে ও শিখতে আসবে। এর কিছুদিন পর শিক্ষামন্ত্রী আরেকটি অনুষ্ঠানে দাবি করেন, বাংলাদেশ শিগগিরই পৃথিবীর অন্যতম সেরা ‘এডুকেশন হাব’ বা শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হবে।

বাস্তবতার নিরিখে এবং আমাদের শিক্ষা ও শ্রমদক্ষতার বৈশ্বিক সূচক বিচারে এই বক্তব্যগুলো যেমন একদিকে অতিশয়োক্তি ও আত্মতুষ্টিতে ভরা; অন্যদিকে শিক্ষাক্ষেত্রের বর্তমান অচলাবস্থা, সংকট ও হতাশা নিরসনে রাজনৈতিক নেতৃত্বের এই সংস্কারমুখী উচ্চাকাঙ্ক্ষা শিক্ষানুরাগীদের মনে কিছুটা আশার আলোও জাগায়। তবে নেতৃত্বের সর্বোচ্চ পর্যায়ের এই দূরদর্শী চিন্তাকে সাধুবাদ জানানোর পাশাপাশি স্বপ্ন বাস্তবায়নে প্রয়োজন নাগরিকদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং স্থানীয় পর্যায়ের শিক্ষা-উদ্যোগ ও উদ্যোক্তাদের রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া।

উদ্ভাবনের অতীত ঐতিহ্য বনাম বর্তমান বাস্তবতা

স্বাস্থ্য ও শিক্ষা পরিষেবা প্রাপ্তির প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলায় স্বল্প খরচের উদ্ভাবনী সমাধান প্রদানে বাংলাদেশের একটি দীর্ঘ ও গৌরবময় ঐতিহ্য রয়েছে। ব্র্যাকের ‘১ শিক্ষক, ১ শ্রেণিকক্ষ’ মডেল কিংবা সরকারি খাতের ‘রিচিং

আউট অব স্কুল চিলড্রেন' প্রকল্প একসময় দুর্গম এলাকার নিম্ন আয়ের পরিবারের কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিয়েছিল। ব্র্যাকের এই অনানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা মডেলটি পরবর্তী সময়ে আফ্রিকা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশেও অনুসৃত হয়েছে। ঠিক যেভাবে ওরাল ডিহাইড্রেশন স্যালাইনের মাধ্যমে ডায়রিয়া প্রতিরোধে আমাদের বৈশ্বিক সাফল্য বিশ্বস্বীকৃত।

তবে নব্বইয়ের দশকের তুলনায় আজকের বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রের চ্যালেঞ্জ সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখন সিংহভাগ শিশুকে স্কুলে নিয়ে আসা সম্ভব হলেও, মূল চ্যালেঞ্জ হলো তাদের প্রকৃত শিখন নিশ্চিত করা। শিক্ষা বাজেট ঘাটতি উত্তরণে অতীতের উদ্ভাবনী অর্জনের ওপর ভিত্তি করে এখন আমাদের প্রয়োজন 'শিক্ষা দারিদ্র্য' বা 'লার্নিং পভার্টি' নিরসনে সম্পূর্ণ নতুন মডেল ও যুগোপযোগী চিন্তা।

আশার কথা হলো, সাম্প্রতিক সময়ে বেসরকারি খাত ও এনজিওগুলোর উদ্যোগে শিক্ষাসংক্রান্ত বেশ কিছু উদ্ভাবনী প্রকল্পের প্রসার ঘটেছে। কিন্তু দুঃখজনক বাস্তবতা হলো, এই প্রযুক্তিগত ও কৌশলগত শিক্ষামূলক উদ্ভাবনগুলো এখনো সরকারের মূলধারার শিক্ষা প্রকল্পগুলোতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি।

- **দুঃখজনক বাস্তবতা হলো, এই প্রযুক্তিগত ও কৌশলগত শিক্ষামূলক উদ্ভাবনগুলো এখনো সরকারের মূলধারার শিক্ষা প্রকল্পগুলোতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি।**

- **দেশব্যাপী কোনো মডেল বিস্তারের পূর্বে আমাদের গভীরভাবে ভাবতে হবে—এখানে শিক্ষার অর্থনীতিটা শিক্ষার্থীদের উপকারে আসছে, নাকি শুভংকরের ফাঁকি তৈরি করছে।**
- **ইতিহাস বলে, বিশ্ব তখনই কোনো দেশের কাছ থেকে শিখতে যায়, যখন সেই দেশের নিজস্ব মৌলিক, কার্যকর এবং সাশ্রয়ী উদ্ভাবন বা প্রস্তাবনা থাকে।**

স্থানীয় উদ্যোগের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

একটি গবেষণা প্রকল্পের কাজে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে আমি থাইল্যান্ডের চুলালংকর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলাম। সেখানে এক তরুণ বাংলাদেশি শিক্ষা-উদ্যোক্তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তিনি ব্যাংককে রসায়নের একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ থেকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নির্বাচিত মাত্র ১০ জন রসায়ন শিক্ষক নিয়ে এসেছিলেন। এই শিক্ষকেরা দক্ষিণ এশিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিত শিক্ষকদের সঙ্গে অভিজ্ঞতা বিনিময় ও বিশেষ প্রশিক্ষণে অংশ নেন। এত বড় একটি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনার পেছনে যৌথভাবে ছিল বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) কেমিকৌশল বিভাগ এবং সেই তরুণ উদ্যোক্তাদের একটি এডটেক প্রতিষ্ঠান।

প্রসঙ্গক্রমে জানতে পারলাম, আমাদের দেশের সব বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় ল্যাবরেটরি সুবিধা দেওয়া সম্ভব হয় না। তা ছাড়া রাসায়নিক পরীক্ষার বিভিন্ন উপকরণের নিরাপদ ব্যবহারও সব সময় নিশ্চিত করা কঠিন। এই সীমাবদ্ধতা দূর করতে থাইল্যান্ড কেমিক্যাল সোসাইটির সঙ্গে যৌথভাবে এই তরুণদের দলটি বাংলাদেশে ‘স্মল স্কেল কেমিস্ট্রি’ নামক একটি পাইলট ট্রেনিং প্রজেক্ট পরিচালনা করে। থাইল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়া ও ভারতের একটি বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষক দল এরই মধ্যে বাংলাদেশের নির্বাচিত ১০০ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দিয়ে গেছে।

কোনো বড় বাজেটের উচ্চাভিলাষী সরকারি প্রকল্প ছাড়াই এত চমৎকার এবং আন্তর্জাতিক মানের একটি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়ে গেল দেখে আমি বেশ আশান্বিত হই। আরও চমকপ্রদ বিষয় হলো, এই প্রশিক্ষণ আয়োজিত হয়েছিল ঢাকার প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে (পিটিআই)।

প্রাথমিক শিক্ষার আলোচনায় মাধ্যমিক শিক্ষার এই উদাহরণ টানার একটি বিশেষ কারণ রয়েছে। ব্যাংককের এক রেস্তোরাঁয় আলাপকালে সেই তরুণ উদ্যোক্তার কাছে জানতে পারলাম, উদ্যোগটি শুরু করার আগে তাঁরা বাংলাদেশের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে গণিত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য কাজ করেছিলেন। এই তরুণ-তরুণীরা মাঠপর্যায়ে বাংলাদেশের শত শত প্রাথমিক বিদ্যালয় ঘুরেছেন এবং হাজারের বেশি প্রাথমিক শিক্ষকের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছেন।

কাঠামোগত অনাস্থা ও স্থানীয়করণের গুরুত্ব—এ বিষয়টি আমাকে গভীরভাবে আলোড়িত করে। দেশে ফিরে আমি আরও কয়েকজন স্থানীয় সফল শিক্ষা-উদ্যোক্তার সঙ্গে কথা বলি, যা আমার চিন্তাভাবনায় একটি বড় পরিবর্তন

আনে। খোঁজ করতে গিয়ে দেখি, গণিতের মতো বিজ্ঞান শিক্ষায় সাড়াজাগানো আরেকটি দেশীয় উদ্যোগের গল্পও বেশ আশাব্যঞ্জক।

পাঠ্যবইয়ের নিরানন্দ তত্ত্বের বাইরে গিয়ে বিজ্ঞানকে শিশুদের কাছে সহজ, মজার এবং হাতে-কলমে শেখানোর অভিপ্রায় থেকেই যাত্রা শুরু সেই উদ্যোগের। বিজ্ঞানের অসংখ্য আগ্রহোদ্দীপক পরীক্ষাকে হাতের কাছে নিয়ে আসতে তারা বেশ কিছু সায়েন্স কিট ডেভেলপ করে। ইতিমধ্যে লক্ষাধিক কিটবক্স বাংলাদেশের বাজারে বিক্রি হয়েছে, যা প্রথমে শুনে আমার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল। এখান থেকে বোঝা যায়, বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে স্থানীয় এই উদ্ভাবনগুলো বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণের মতো সম্ভাবনা বহন করে।

তাই প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী যখন বলেন বিশ্ব বাংলাদেশের কাছ থেকে শিখতে আসবে, তখন আপাতদৃষ্টিতে কথাটি অবাস্তব শোনালেও এটি একটি ইতিবাচক আশাবাদের সৃষ্টি করে। কিন্তু এই স্বপ্ন তখনই সফল হবে, যখন আমরা স্থানীয় উদ্ভাবনগুলোকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে গুরুত্বসহকারে মূল্যায়ন করব এবং বোঝার চেষ্টা করব যে এই আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত দেশীয় উদ্যোগগুলো আমাদের জাতীয় শিক্ষার উন্নয়নে কী ভূমিকা রাখতে পারে।

তবে এ ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখা জরুরি। বাংলাদেশের শিক্ষায় ‘ লোকালাইজড ইনোভেশন’ বা স্থানীয় উদ্ভাবনের কথা বললেই অনেক সময় আমলাতান্ত্রিক স্তরে আকাশকুসুম কল্পনাপ্রসূত বিভিন্ন প্রকল্প তৈরি করতে দেখা যায়, যা মাঠপর্যায়ে শিক্ষার্থী বা শিক্ষকদের কোনো কাজে আসে না। অবশ্য প্রকল্পের মূল্যায়নের সঠিক ব্যবস্থা না থাকায় কোনটি সফল আর কোনটি ব্যর্থ, তা নির্ধারণ করা কঠিন। বিগত বছরগুলোতে যেকোনো প্রকল্পের কি পারফরম্যান্স ইন্ডিকেটর (কেপিআই) অনুযায়ী স্বচ্ছ মূল্যায়নের যে ঘাটতি আমরা দেখেছি, তার ফলে অন্ধের হাতি দেখার মতো শিক্ষার উন্নয়ন সম্পর্কে একটি ভুল ধারণা তৈরি হয়।

বিগত বছরগুলোতে রাষ্ট্রীয় শিক্ষাকাঠামোর দুর্বলতার কারণে অনেক অভিভাবককে জাতীয় শিক্ষাক্রমের বিকল্প খোঁজার চেষ্টা করতে দেখা গেছে। সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি মানুষের এই যে আস্থার সংকট, তা মূলত তৈরি হয়েছে সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার অদক্ষতা থেকে। শিক্ষাক্রম প্রণয়ন থেকে শুরু করে প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যন্ত সমন্বয়ের অভাব সব সময়ই লক্ষ্য অর্জনে সংশয় তৈরি করে। অথচ বিশ্বব্যাপী শিক্ষাসংক্রান্ত যেকোনো আধুনিক আলোচনায় বর্তমানে ‘ লোকালাইজেশন’ বা স্থানীয়করণ একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ও কার্যকর ধারণা।

বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় দুই কোটি শিক্ষার্থী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে। ইউনিসেফের প্রতিবেদন অনুযায়ী, শিক্ষকদের দক্ষতার দিক থেকে দক্ষিণ এশিয়ায় আমাদের অবস্থান সন্তোষজনক নয়। ২০১৫ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত জাতীয় স্কুল মূল্যায়ন অনুসারে প্রাথমিকের অর্ধেক শিক্ষার্থী নিজ শ্রেণির বই পড়তে পারে না এবং দুই-তৃতীয়াংশ শিক্ষার্থী গণিতের বেসিক কাউন্টিং করতে পারছে না। অথচ প্রাথমিকের শিক্ষার্থীদের ভাষা ও গণিতের অদক্ষতা দূর করার জন্য বিভিন্ন মেয়াদে সরকারি পর্যায়ে অসংখ্য ব্যয়বহুল প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। কিন্তু এসব প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কতটুকু অর্জিত হয়েছে, তা সব সময়ই প্রশ্নবিদ্ধ রয়ে গেছে।

উত্তরণের পথ ও দূরদর্শী নেতৃত্ব

ব্যাংককের সেই আলাপে ফিরে যাই। সেই তরুণ উদ্যোক্তা আমাকে জানিয়েছিলেন, বৈশ্বিক উদ্ভাবনের সুযোগ মাথায় রেখে তাঁরা স্থানীয় প্রেক্ষাপট অনুযায়ী গণিতের শিখন সামগ্রী তৈরি করেছিলেন, যা আজ বিশ্বমঞ্চে সমাদৃত। বিষয়টি আবার উল্লেখ করার কারণ হলো, আমাদের নতুন প্রজন্ম এই রাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থার যে মৌলিক পরিবর্তন চায়, তার নেতৃত্ব তারা নিজেদের মেধা দিয়ে দিতে সক্ষম। কিন্তু প্রশ্ন হলো, আমরা আমাদের রাষ্ট্রীয় নীতিমালাকে কতটুকু দেশীয় উদ্ভাবনবান্ধব করতে পেরেছি?

এই প্রসঙ্গে আরেকটি শিক্ষা উদ্যোগের গল্প বলা জরুরি বলে মনে করছি। উদ্যোক্তার সঙ্গে আমার পরিচয় খুব বেশি দিন আগের নয়। কিন্তু কথা বলেই খেয়াল করলাম শিক্ষার অচলাবস্থা ও সংকটের এই সময়ে এ উদ্যোগটিও বেশ আশাজাগানিয়া। প্রাথমিক শিক্ষার কেন্দ্র থেকে একটি প্রজেক্ট ২০১৬ সালে পথচলা শুরু করে একটি বৃহৎ শিক্ষা-ইকোসিস্টেমে রূপ নেয়। সম্পূর্ণ প্রাইভেটাইজড মডেলে চলা প্রাক্‌প্রাথমিক ও প্রাথমিকের শিক্ষার্থীদের জন্য এই ধরনের প্রোডাক্ট-বেজড উদ্যোগ আমার চোখে আগে পড়েনি। গল্পের বই, খেলনা, পুতুল আর স্কুল-পরবর্তী সৃজনশীল কর্মশালার মাধ্যমে শিশুদের কল্পনাশক্তি, সৃজনশীলতা ও সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বাড়ানোর প্রত্যয়ে তাঁরা কাজ করে যাচ্ছেন। এমনকি কার্যক্রম প্রাক্-প্রাথমিক শিশুদের আবেগীয় বুদ্ধিমত্তা এবং নৈতিক মূল্যবোধ বিকাশেও গুরুত্বারোপ করে।

স্বল্প খরচে স্কুল লাইব্রেরি স্থাপনের মাধ্যমে কয়েক হাজার শিক্ষার্থীকে বই পড়ার সুযোগ করে দেওয়া থেকে শুরু করে দেশের বিভিন্ন জেলায় শিক্ষক ও অভিভাবক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা পর্যন্ত এর পরিধি ব্যাপক। আমি উদ্যোক্তার কাছ থেকে আগ্রহভরে জানতে চাইলাম, সরকারের সঙ্গে এই কাজগুলো করা হয়েছে কি না। তিনি আমাকে জানালেন, জাতীয় পর্যায়ে স্বীকৃতি পাওয়া ছাড়া সে রকম কোনো সরকারি কার্যক্রমে তিনি এখনো পর্যন্ত যুক্ত হননি। যা বুঝলাম, সরকারি কাজের দীর্ঘসূত্রতা এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতা আমাদের উদ্ভাবনী উদ্যোক্তাদের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করতে অনাগ্রহ তৈরি করে। এই ব্যবধানগুলো কমাতে সরকারকে আরও আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে। মাথায় রাখতে হবে, শিক্ষা-উদ্যোক্তাদের চিন্তার জগৎ রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন থেকে তৈরি হয়। তাই তাঁদের কাজকে দেশের স্বার্থে লাগাতে হলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গতিশীলতা এবং আন্তরিকতা উভয়ই জরুরি।

আমরা যদি আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোর দিকে তাকাই, তবে দেখব ভারত তার নিজস্ব শিক্ষাগত সংকট দূর করতে দেশীয় এডটেক ও স্থানীয় উদ্ভাবনকে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করে। মালয়েশিয়া বা ভিয়েতনাম তাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে নিজেদের আর্থসামাজিক প্রয়োজন অনুযায়ী সাজিয়ে নিয়েছে এবং স্থানীয় উদ্ভাবনকে কাজে লাগিয়ে ক্লাসরুমের রূপান্তর ঘটাচ্ছে।

আমাদের দেশের শিক্ষকের দক্ষতা, ক্লাসরুমের ধারণক্ষমতা এবং অতীত অভিজ্ঞতা বারবার মনে করিয়ে দেয় যে পশ্চিমা দেশের মডেল হুবহু ধার করে এনে আমাদের শিক্ষার সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়। তা ছাড়া সরকারিভাবে গৃহীত বড় বড় প্রকল্পের পাইলটিং পর্যায়ের যথাযথ মূল্যায়নের ঘাটতি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে

দেশব্যাপী কোনো মডেল বিস্তারের আগে আমাদের গভীরভাবে ভাবতে হবে—এখানে শিক্ষার অর্থনীতিটা শিক্ষার্থীদের উপকারে আসছে, নাকি শুভংকরের ফাঁকি তৈরি করছে।

দেশের প্রাথমিক শিক্ষার মৌলিক পরিবর্তন করতে হলে আমাদের বৈশ্বিক গতিপ্রকৃতি যেমন বুঝতে হবে, তেমনি আমাদের দেশীয় উদ্ভাবনী শিক্ষা-উদ্যোক্তাদের সঙ্গেও রাষ্ট্রকে মুক্তমনে সংলাপে বসতে হবে। যাঁরা দেশের শিক্ষার এই মানসম্মত রূপান্তরের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন, তাঁদের সমাধানগুলোকে রাষ্ট্রীয়ভাবে যাচাই করে দেখতে হবে।

ইতিহাস বলে, বিশ্ব তখনই কোনো দেশের কাছ থেকে শিখতে যায়, যখন সেই দেশের নিজস্ব মৌলিক, কার্যকর এবং সাশ্রয়ী উদ্ভাবন বা প্রস্তাবনা থাকে। তাই বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার মানোন্নয়নের জন্য আমরা যদি আমলাতান্ত্রিক নির্ভরতা কমিয়ে দেশীয় উদ্ভাবনগুলোকে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে ছড়িয়ে দিতে পারি, তবেই কেবল বিশ্ব বাংলাদেশের কাছে শিক্ষা নিতে আসবে। আর সেই মহৎ লক্ষ্য অর্জনের জন্য এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন দূরদর্শী রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং উদ্ভাবনী মানসিকতার চর্চা।

● **ড. এম নিয়াজ আসাদুল্লাহ** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক

*মতামত লেখকের নিজস্ব

prothomalo.com

সম্পাদক ও প্রকাশক: মতিউর রহমান

স্বত্ব © ১৯৯৮-২০২৬ প্রথম আলো